সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী ও তার তাৎপর্য

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৬ জুলাই ২০১১)

গত ৩০ জুন আমাদের জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিল ২৯১-১ ভোটে পাশ হয়েছে। একমাত্র বিরোধীতাকারী ছিলেন স্বতন্ত্র মাননীয় সদস্য জনাব ফজলুল আজিম। অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের ১১ জন ও জাতীয় পার্টির ১ জন সদস্য। উল্লেখ্য যে, মহাজোটের শরিক দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগের ২৭০, জাপার ২৯, জাসদের ৩ এবং ওয়ার্কার্স পার্টির ২ জন সদস্য রয়েছেন।

পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে, মোটা দাগে, সংবিধান থেকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাদ পড়ে গেল। স্থায়ীত্ব পেল রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলাম। সংযুক্ত হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা। স্বীকৃতি পেল বল প্রয়োগ করে সংবিধান সংশোধন, বাতিল, স্থগিত ও সংবিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থাহীনতা সৃষ্টি ইত্যাদি এবং এ কাজে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান ও সমর্থন রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে। অবৈধ হলো সংবিধানের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সংশোধন। বর্ধিত হল সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন আরও পাঁচটি। বাতিল হল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার। হয়নি বিচারবিভাগের পৃথকীকরণের লক্ষ্যে সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের পুনস্থাপন ও আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান ইত্যাদি।

সংবিধানে এসকল পরিবর্তনের দু'টি দিক রয়েছে। একটি পদ্ধতিগত দিক। আরেকটি হল সংবিধান সংশোধনের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত। এ দু'টি দিক নিয়ে শুধু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মধ্যেই নয়, অনেক নাগরিকের মনেও গুরুতর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বস্তুত আমাদের আশঙ্কা যে, এসকল পরিবর্তনের পরিণতি অশুভ হবে।

পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা: সংবিধান সংশোধনী বিল পাশের পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক। গত ২১ জুলাই ২০১০ তারিখে সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংসদীয় বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়, যাতে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি'র কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল না – সরকারের পক্ষ থেকে সদস্যপদ প্রদান করা হলেও বিএনপি তা গ্রহণ করেনি। কমিটির জন্য কোনো টিওআর বা কার্যপরিধি নির্ধারিত করা ছিল না।

তবে বিশেষ কমিটি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী সংসদে বলেন – সামরিক ফরমান জারি করে অতীতে সংবিধানকে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে; আর সেজন্যই সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের বুকে যাতে সামরিক শাসনের জগদ্দল পাথর আর চেপে বসতে না পারে, সে ব্যবস্থা নিতেই এ কমিটি। উচ্চ আদালতের নির্দেশনার অনুসরণে সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে এটি গঠন করা হচ্ছে। কমিটি প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের ভিত্তিতে এ বিষয়ে তাদের সুপারিশ চূড়ান্ত করবে (*প্রথম আলো*, ২১ জুলাই ২০১০)। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী কমিটির উদ্দেশ্য মূলত সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী সম্পর্কিত আদালতের রায় বাস্তবায়ন এবং অবৈধ ক্ষমতা দখল রোধ করা।

পরবর্তীতে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে কমিটির সভাপতি বেগম সাজেদা চৌধুরী অবশ্য সংবিধান সংশোধনের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের কথা বলেন: অবৈধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতার দখল বন্ধ করা; জনগণের স্বাধীন-সার্বভৌম ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা; মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত ও সংরক্ষণ করা; আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটের নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণ ও জনগণের প্রদত্ত ম্যান্ডেট বাস্তবায়ন করা; এবং সর্বোচ্চ আদালতের রায় কার্যকর করা *(যুগান্তর, ২৩ জুলাই ২০১০)*।

কমিটি ২৭টি বৈঠক করা ছাড়াও, তিনজন সাবেক প্রধান বিচারপতি, ১১ জন শীর্ষ আইনজীবি ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ, ১৮ জন বুদ্ধিজীবি, ১৮টি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক, রাজনৈতিক দল ও সেক্টরস কমান্ডারস ফোরাম নেতাদের মতামত নেয়। সিপিবি কমিটির কাছে লিখিত সুপারিশ প্রদান করে। বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট নাগরিকদের অধিকাংশই বিরোধী দলকে সম্পৃক্ত করার পক্ষে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করার ও ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংবিধানে রাখার বিপক্ষে মতামত দেন। কিন্তু এসকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কোনো সুপারিশ না রেখেই কমিটি তার রিপোর্ট চূড়ান্ত করে (*যুগান্তর*, ১ জুলাই ২০১১), যদিও প্রধানমন্ত্রী বিশেষজ্ঞদের সুপারিশের ভিত্তিতে কমিটির প্রস্তাব চূড়ান্ত করার কথা সংসদে বলেছিলেন। এছাড়াও কমিটি সাধারণ নাগরিকদের কোনো মতামতই গ্রহণ করেনি।

গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, কমিটির চূড়ান্ত করা রিপোর্টে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ২৭ মে তারিখের *সমকালে*'র হেডলাইন ছিল 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার রেখেই সংবিধান সংশোধন হচ্ছে।' অন্যান্য প্রায় সব জাতীয় দৈনিকও একই হেডলাইন করেছিল। কিন্তু কমিটির ৩০ মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর প্রেক্ষাপট বদলে যায় এবং কমিটির অবস্থান দাঁড়ায় – 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাখার সুযোগ নেই' (*প্রথম আলো*, ৩১ মে ২০১১)। কমিটির একাধিক সদস্য অবশ্য এব্যাপারে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে সংবাদপত্রে রিপোর্ট বেরিয়েছে। এরপর তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাদ দিয়ে গত ৮ জুন তারিখে প্রকাশিত ৫১টি সুপারিশ সম্বলিত কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট সংসদে উত্থাপন করা হয়। সুপারিশগুলো দেখে মনে হয় যেন কমিটি এক ধরনের 'ফিশিং এক্সপেডিশনে' লিপ্ত হয়েছে, যদিও কমিটির অনেক গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে বলতে শোনা গিয়েছে যে, তাদের সুপারিশে কোনো বড় ধরনের পরিবর্তনের কথা থাকবে না।

কমিটির সুপারিশগুলো ২০ জুন তারিখে মন্ত্রিসভা অনুমোদন করে এবং চারদিন পর এগুলো ২৫ জুন বিল আকারে সংসদে উত্থাপন করা হয়। একই দিনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য দুই সপ্তাহের সময় দিয়ে আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে এটি প্রেরণ করা হয়। কমিটি ৪টি উপ-দফা যুক্তের সুপারিশ করে মোট ৫৫টি দফা সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করে ২৯ জুন। পরদিন অর্থাৎ সংসদে উত্থাপনের পাঁচ দিনের মাথায় বাজেট অধিবেশনেই – এর জন্য সংসদের কোনো বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়নি – সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিলটি পাশ হয়।

সংবিধান একটি দেশের সর্বোচ্চ আইন; বস্তুত এটি কোনো সাধারণ আইন নয়। এতে প্রতিফলিত হয় 'জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি' [অনুচ্ছেদ ৭(২)]। সংবিধান জাতির জন্য ধ্রুবতারা সমতূল্য। এটি কোনো ব্যক্তি বা দলের সম্পত্তি নয়। তাই জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতেই সংবিধান সংশোধন আবশ্যক। কিন্তু সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাশ হয়েছে এতরফাভাবে, অস্বচ্ছ পদ্ধতিতে এবং অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে। বিরোধী দলের সম্পৃক্ততা ছাড়া এবং বিশিষ্টজনদের মতামত সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেই। বিএনপি অবশ্য সম্পূর্ন অযৌক্তিকভাবেই সংসদ বর্জন করছে এবং সংবিধান সংশোধন প্রক্রিয়া থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখেছে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী এক সংবাদ সম্মেলনে আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: "সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলও রাষ্ট্র পরিচালনার অংশীদার। বিরোধী দলের ইতিবাচক সমালোচনা, পরামর্শ এবং সংসদকে কার্যকর করতে তাদের ভূমিকা ও মর্যাদাকে সমুন্নত রাখব" (*প্রথম আলো*, ১ জানুয়ারি ২০০৯)। কিন্তু বাস্তবতা হল যে, সংবিধান সংশোধনের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজেও বিরোধী দলের কোন ভূমিকা ছিল না।

আরেকটি বিরাট পদ্ধতিগত ত্রুটি হল যে, সংশোধনটি পাশ করার ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় সংসদ এবং আইন ও সংসদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি তাদের দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করেনি। সংসদীয় গণতন্ত্রে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিভাজিত হয় তিনটি বিভাগের মধ্যে: নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা ও বিচারবিভাগ। এ তিনটি প্রতিষ্ঠান স্বাধীন সত্ত্বার অধিকারী হওয়ার এবং পরস্পরের ওপর নজরদারিত্ব রাখার কথা। ক্ষমতার এরূপ বিভাজনের (separation of powers) মাধ্যমেই রাষ্ট্র পরিচালনায় একটি 'চেকস এন্ড ব্যালেন্সেস' পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাশ করার ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় সংসদ নির্বাহী বিভাগের আজ্ঞাবহ হিসেবেই কাজ করেছে। অর্থাৎ আবারও প্রমাণিত হল যে, আমাদের সংসদ একটি অকার্যকর প্রতিষ্ঠান ও মূলত একটি রাবার স্টাম্পিং বডি। আর আমাদের 'বা'-ঘরণার কয়েকজন সংসদসদস্য কিছু পাঁয়তারা করলেও নীতি-আদর্শ সম্পূর্ণভাবে জলাঞ্জলী দিয়ে সংসদসদস্যপদ রক্ষার খাতিরে শেষ পর্যন্ত সংশোধনীর পক্ষেই ভোট দিয়েছেন। অর্থাৎ তারা বিবেকের আদালতে হেরে গিয়েছেন।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংসদের প্রাণ এবং এর ভূমিকা অতন্দ্রপ্রহরীর। কিন্তু দুই সপ্তাহ সময় দেওয়া হলেও চার দিনের মধ্যে মাত্র দু'টি বৈঠকেই সংশ্লিষ্ট কমিটি তার সুপারিশ চূড়ান্ত করে। কমিটি প্রস্তাবিত বিল থেকে কোনো কিছুই বাদ দেয়নি, শুধুমাত্র কয়েকটি গুরুত্বহীন সংযোজন এতে করা হয়েছে। কমিটি যে স্বাধীনভাবে কাজ এবং অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করেনি তা সুস্পষ্ট হয় কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের একটি বক্তব্য থেকে। তিনি বলেছেন: "আমি আওয়ামী লীগ করি। আওয়ামী লীগের নীতি ও সিদ্ধান্তই আমার নীতি ও সিদ্ধান্ত। শেখ হাসিনা আমার নেত্রী। এর বাইরে কিছু নেই" (*বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১ জুলাই ২০১১)।

এটি সুস্পষ্ট যে, সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতই, যাকে জেমস মেডিসন ও অন্যান্যরা 'টিরানি অব দি মেজরিটি' বলে আখ্যায়িত করেছেন, জাতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এছাড়াও এর মাধ্যমে সমঝোতার পরিবর্তে সংঘাতের রাজনীতির প্রসার ঘটে।

সংবিধান সংশোধনের বিষয়বস্তু: তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল ও নিরপেক্ষ নির্বাচন: সংশোধনীর বিষয়বস্তুর বিষয়ে আসা যাক। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে উচ্চ আদালতের রায়ের দোহাই দিয়ে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায় এখনও প্রকাশিতই হয়নি। গত ১০ মে তারিখে ঘোষিত সংক্ষিপ্ত ও বিভক্ত আদেশে আদালত বলেছেন: æ(2) The Constitution (Thirteenth Amendment) Act, 1996 ... is prospectively declared void and ultra vires the Constitution. (3) The election to the Tenth and the Eleventh Parliament may be held under the provisions of the above mentioned Thirteenth Amendment on the age old principles, namely, quod alias non est licitum, necessitas licitum facit (That which otherwise is not lawful, necessity makes lawful), salus populi suprema lex (safety of the people is the supreme law) and salus republicae est suprma lex (safety of the State is the Supreme Law)." ["(২) সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ভবিষ্যতের জন্য বাতিল ও অসংবিধানিক বলে ঘোষণা করা হলো। (৩) যা সাধারণত আইনসিদ্ধ নয়, প্রয়োজন তাকে আইনসিদ্ধ করে, জনগণের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ আইন, এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ আইন – এ সকল সনাতন তত্ত্বের ভিত্তিতে দশম ও একাদশ সংসদ নির্বাচন পূর্বে উল্লেখিত ত্রয়োদশ সংশোধনীর অধীনে অনুষ্ঠিত হতে পারে।"

অন্যভাবে বলতে গেলে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে 'প্রসপেকটিভলি' বা ভবিষ্যতের জন্য অবৈধ ঘোষণা করে রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তার খাতিরে এটি আরও দুই টার্ম রাখার পক্ষে আমাদের সর্বোচ্চ আদালত মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ আদালত অতীতের এবং আগামী দুই টার্মের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে 'কনডোন' বা মার্জনা করেছেন। আই আদালতের রায়ের অজুহাত দেখিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া দূরূহ।

তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বাতিল আমাদেরকে এক ভয়াবহ সংকটের দিকে ধাবিত করতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন ছিল রাজনৈতিক দলের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের এবং দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় – জনগণের বিরাট অংশের এমন ধারনারই ফসল। এর জন্য আরও দায়ী নির্বাচন কমিশনের অকার্যকরিতা, রাজনৈতিক দলের অসদাচরণ ও বিধিবিধানের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং প্রার্থীদের ছলে-বলেকলে-কৌশলে নির্বাচনে জেতার মানসিকতা। এ অবস্থার পরিবর্তন এখনও হয়নি।

যেমন, নির্বাচন কমিশন এখনও পুরোপুরি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে বলে মনে হয় না। উদাহরণস্বরূপ, নবম জাতীয় সংসদ অনুমোদিত *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২ অনুযায়ী, নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা, অঙ্গ/সহযোগী সংগঠন ও বিদেশি শাখার বিলুপ্তি বাধ্যতামূলক হলেও, আমাদের নির্বাচন কমিশনের পক্ষে, রাজনৈতিক দলগুলোর রক্তচক্ষুর কারণে, এগুলো কার্যকর করা সম্ভবপর হয়নি। এছাড়াও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও (অনুচ্ছেদ ১১৮), নির্বাচন কমিশনে নিয়োগের ব্যাপারে এ পর্যন্ত কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়নি, ফলে বর্তমান নির্বাচন কমিশনারদের মেয়াদ আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তীর্ণ হওয়ার পর পরবর্তীতে যে সং, যোগ্য, নিরপেক্ষ ও নির্ভীক ব্যক্তিদেরকে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দেওয়া হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। এ ব্যাপারে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা ইতিবাচক নয়।

আর শুধু নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী ও স্বাধীন করলে এবং এতে যোগ্য ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ দিলেই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত হবে না। এর জন্য আরও প্রয়োজন হবে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরপেক্ষতা। যেমন, একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ১০ লক্ষাধিক সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তার সরাসরি সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। এরা যদি নিরপেক্ষ আচরণ না করে, তাহলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রায় অসম্ভব।

প্রসঙ্গত, ২২ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠেয় দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। আমরা শুনেছি, ড. ইয়াজউদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও বিচারপতি আজিজের নেতৃত্বের নির্বাচন কমিশনকে মেনে নিয়েই মহাজোট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিল, কারণ তারা আত্মবিশ্বাসী ছিল যে, নির্বাচনে জয়ী হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে এ আশঙ্কা থেকে যে, তারা নির্বাচনে জয়ী হলেও, চরম পক্ষপাতদুষ্ট প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নির্বাচনী ফলাফল পাল্টে দিতে পারে। বিএনপি'র ডাকা গত ৬-৭ জুলাইয়ের হরতালের সময় পক্ষপাতদুষ্ট আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কী জঘন্য আচরণে লিপ্ত হতে পারে, তার একটি নমুনা দেশবাসী দেখেছে।

সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দল এবং তাদের মনোনীত প্রার্থীদের সদাচারণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতীতে দেখা গিয়েছে (যেমন, মাগুরার উপনির্বাচনে) ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও দলের মনোনীত প্রার্থীরা প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে কিংবা পরোক্ষ

নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে নির্বাচনী কারচুপিতে লিপ্ত হয়। তাই রাজনৈতিক দলগুলো অপকর্মে লিপ্ত এবং যে কোনো মূল্যে নির্বাচনে জেতার জন্য বদ্ধপরিকর হলে, সবচেয়ে শক্তিশালী ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশনও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই নির্বাচনী সমীকরণে নির্বাচন কমিশন একটি পক্ষ মাত্র। অর্থাৎ সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, ক্ষমতাসীনরা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার কথা বললেও, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরপেক্ষতার এবং রাজনৈতিক দলের সদাচারণ ও সংস্কারের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিতই থেকে যাচ্ছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের ফলে দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যাপারে সরকারের আশ্বাসে বিশ্বাস করলেও, অভিজ্ঞতা ভিন্ন কথা বলে। অতীতে দলীয় সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনই নিরপেক্ষ হয়নি (*আমাদের সময়*, ৩ জুলাই ২০১১)। আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় ভবিষ্যতে তা সম্ভব বলেও আশা করা যায় না। আমাদের প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে যে ধরনের দলীয়করণ হয়েছে এবং হচ্ছে, তাতে সরকারকে নির্বাচন প্রভাবিত করতে কিছুই করতে হবে না – এমনকি ক্ষমতাসীনদের চোখের ইশারাও লাগবে না। দলতন্ত্রে লিপ্ত ও ফায়দাতন্দ্রের সুফলভোগকারী কর্মকর্তারা তাদের নিজেদের স্বার্থে স্বপ্রনোদিত হয়েই তা করবেন। তাই বর্তমান বাস্তবতায় দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীনদেরকে ক্ষমতা থেকে সরানো প্রায় অসম্ভব হবে। ফলে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ই ভেঙ্গে পড়তে পারে এবং আমরা ভবিষ্যতে ভয়াবহ সঙ্কটের দিকে ধাবিত হতে পারি। প্রসঙ্গত, পঞ্চদশ সংশোধনীর ফলে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলেও, কেউ কেউ অন্তবর্তী কালীন সরকারের কথা বলে এক ধরনের ধূম্রজার সৃষ্টি করা হয়েছে।

রাজনৈতিক অস্থিরতা, দ্বন্দ্ব ও হানাহানির পরিণতি আমরা জানি। এ ধরনের অবস্থা আমাদের অর্থনীতিকে পঙ্গু করবে। উগ্রবাদকে উস্কিয়ে দেবে, কারণ দ্বন্দ্বে লিপ্ত রাজনৈতিক দলগুলোই সমর্থনের বিনিময়ে তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দেবে, যা অতীতে হয়েছে। এছাড়াও উগ্রবাদীরা ঘোলাপানিতে মাছ শিকারে পটু। আর জঙ্গিবাদের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস আমাদের ঘাড়ের ওপর ইতোমধ্যেই পড়ছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ইত্যাদি: সংবিধানের ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কিত ঘোষণার মধ্যে একটি চরম গোজামিল রয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম' বজায় রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বহাল রাখা হয়েছে। অষ্টম অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং কোনো বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান একসঙ্গে যেতে পারে না। এছাড়াও ধর্ম একটি বিশ্বাস – প্রতিষ্ঠান নয় – এবং এর রাষ্ট্রীয়করণ অযৌক্তিক। আমাদের দেশের সাতজন বিশিষ্ট নাগরিক 'তবু কেন রাষ্ট্রধর্ম' শীর্ষক একটি নিবন্ধে এ ব্যাপারে সম্প্রতি তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন (*প্রথম আলো*, ১৫ জুলাই ২০১১) ।

এবিষয়ে আরেকটি গুরুতর স্ববিরোধিতা সৃষ্টি করা হয়েছে বাহাত্তরের সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদ পুনস্থাপিত করার মাধ্যমে। এ অনুচ্ছেদে বলা আছে: "**ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা**। ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য (ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার, এবং (ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার ওপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে।" একযোগে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে ফিরিয়ে আনা, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বজায় রাখা এবং ১২ অনুচ্ছেদে 'রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান' ও 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার' নিষিদ্ধ করা চরমভাবে স্ববিরোধী। এধরনের স্ববিরোধিতা পুরো বিষয়কেই হাস্যাস্পদ করে ফেলেছে।

সংবিধানে একদিকে 'বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম' ও রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে বজায় রাখার পেছনে যুক্তি দেওয়া হয় যে, আওয়ামী লীগ তা না করলে উগ্রবাদীরা তাদের বিরুদ্ধে ধর্মহীনতার অভিযোগ তুলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করবে, যার প্রভাব নির্বাচনের ওপর পড়বে। এটি একটি খোঁড়া যুক্তি। কারণ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এধরনের অপপ্রচার অতীতে ঘটেছে, এমনকি গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও। কিন্তু তাতে আওয়মী লীগ কি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে? তবে এ ধরনের আপোষকামিতার কারণে ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে এবং তার প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে পার্থক্য বহুলাংশে দুরীভূত হয়ে গিয়েছে। অশুভ ঐক্যমত সৃষ্টি হয়েছে তাদের মধ্যে ধর্মসহ অনেকগুলো স্পর্শকাতর বিষয়ে।

সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ ইত্যাদি অপরাধ: পঞ্চম সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত ৭ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী: "(১) কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায়– (ক) এই সংবিধান বা ইহার কোনো অনুচ্ছেদ রদ, বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে; কিংবা (খ) এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে– তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে। (২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত– (ক) কোন কার্য করিতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করিলে; কিংবা (খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে– তাহার এইরূপ কার্যও একই অপরাধ হইবে। (৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।"

এই অনুচ্ছেদ পাকিস্তানের ১৯৭৩ সালের সংবিধানের ৬(১) অনুচ্ছেদেরই অনেকটা প্রতিস্থাপন। পাকিস্তানের সংবিধানে ৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: æ6.(1) Any person who abrogates or attempts or conspires to abrogate, subverts or attempt or conspires to sebvert the Constitution by use of force or show of force or by other unconstitional means shall be guilty of high treason. (2) Any person aiding or abetting the acts mentioned in clauses (1) shall likewise be guilty of high treason. (3) [Majlis-e-Shoora (Parliament) shall by law provide for the punishment of prsons found guilty of high treason." অর্থাৎ ["৬.(১) যদি কোনো ব্যক্তি সংবিধানকে ক্ষমতাবলে বাতিল করে, পরিবর্তন করে, অথবা জোর করে বা শক্তি প্রদর্শন করে বা অন্য কোনো অসাংবিধানিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা বা ষড়যন্ত্র করে, সে ব্যক্তি চরম দেশদ্রোহীতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হবে। (২) কোনো ব্যক্তি (১) ধারায় উল্লেখিত কার্যক্রমের সহায়তা বা উৎসাহ প্রদান করলে, সে ব্যক্তিও একইভাবে চরম দেশদ্রোহীতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হবে। (৩) সংসদ আইনের মাধ্যমে চরম দেশদ্রোহীদের শাস্তি নির্ধারণ করবে।"]

দেশদ্রোহীতার শাস্তি সাধারণত মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। কিন্তু ১৯৭৩ সালের সংবিধান রচনার পর পাকিস্তানে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী জিয়াউল হকের মৃত্যুদণ্ড হয়নি। বরং মৃত্যুদণ্ড হয়েছে সংবিধান প্রণয়নকারী জনাব ভুট্টোর। নিয়তির কী পরিহাস! তাই কঠোর শাস্তির বিধান করে অবৈধ ক্ষমতা দখল এড়ানো যায় না। এছাড়া জেনারেল পারভেজ মোশাররফ এখনও বহাল তবিয়তেই আছেন। অস্ত্রের মুখে ক্ষমতা দখলকারীরা সংবিধান পড়েও ক্ষমতা দখল করেন না। প্রসঙ্গত, আমাদের দেশেও অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী জেনারেল এরশাদ বর্তমানে ক্ষমতাসীন মহাজোট সরকারের সাথেই আছেন।

সংবিধানে ৭ক অনুচ্ছেদ সংযোজন একটি আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত বলে আমাদের ধারণা। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল সমঝোতায় পৌঁছাতে না পারলে, আমাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আবারো ভেঙ্গে পড়তে পারে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ভবিষ্যতে ক্ষমতা বদলের পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে, যা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ প্রশস্ত করবে। আর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল হলে সংবিধান বাতিল বা স্থগিতের প্রশ্ন উঠবে। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে পরবর্তীতে যেকোনো প্রতিবাদী নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ৭ক অনুচ্ছেদ অতি সহজেই ব্যবহার করা যাবে। এমনি পরিস্থিতিতে বর্তমান ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধেও এ অনুচ্ছেদ ব্যবহৃত হতে পারে, যেমনিভাবে অনেক আওয়ামী লীগ নেতাই তাদের সময়কার করা বিশেষ ক্ষমতা আইনের অধীনে বছরের পর বছর জেল খেটেছিলেন। অর্থাৎ ৭ক অনুচ্ছেদ নাগরিকের বাক্ স্বাধীনতার প্রতি চরম হুমকিস্বরূপ। এছাড়াও শাস্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের সংবিধানে দণ্ডবিধির বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হচ্ছে – কিন্তু সংবিধান দণ্ডবিধি নয়।

আর পাকিস্তানের পদাঙ্কই যদি আমরা অনুসরণ করবো, তাহলে সাম্প্রতিককালে সে দেশে যে কয়টি ভাল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো আমাদের রাজনীতিবিদরা বিবেচনায় নিচ্ছেন না কেন? পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা অতীতের সামরিক শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং তাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো কতগুলো বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছেছে। কয়েক বছর আগে নওয়াজ শরীফ ও প্রয়াত বেনজির ভুট্টো একটি 'ডেমোক্রেসী চার্টার' স্বাক্ষর করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে সংবিধানের অষ্টদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সর্বসম্মতভাবে তারা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য এনেছে। আমাদের 'ইম্পেরিয়াল' প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা খর্ব করার ব্যাপারে আমাদের কোনো রাজনৈতিক দলের মধ্যে সে ধরনের আগ্রহই নেই! একইভাবে গত জানুয়ারি মাসে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করা (একজন মাত্র প্রতীকী অর্থে বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন) সংবিধানের ঊনবিংশ সংশোধনের মাধ্যমে পদ্ধতিগতভাবে বিচারপতি নিয়োগ প্রদানের বিধান পাকিস্তান জাতীয় সংসদ পাশ করে। সর্বোপরি, নির্বাচনে নিরপেক্ষতা নিয়ে বিতর্কের উর্ধ্বে তারা উঠতে পেরেছে এবং নির্বাচিত সরকারের টার্ম শেষের আগে ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতাচ্যুত করার অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকছে। অর্থাৎ অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা সমঝোতার রাজনীতির পথ ধরেছে। আর ধর্মান্ধতার ভয়াবহতা সত্ত্বেও পাকিস্তানের রাজনীতিতে সাম্প্রতিককালে যে সুবাতাস বইছে তার পেছনে বড় অবদান রেখেছে সেদেশের সুপ্রিম কোর্ট এবং ঐক্যবদ্ধ আইনজীবি ও নাগরিক সমাজ। দলতন্ত্র আর ফায়দাতন্ত্রের লাগামহীন বিস্তারের ফলে এবং ক্ষমতাসীনদের রক্তচক্ষুর কারণে বাংলাদেশে কি তা সম্ভব?

প্রসঙ্গত, আমাদের রাজনীতিবিদরা 'ওয়ান ইলেভেন' নিয়ে এক ধরনের শ্যাডো বক্সিং বা ছায়ার সাথে মুষ্টিযুদ্ধে লিপ্ত। এ ব্যাপারে প্রত্যেক পক্ষ প্রতিপক্ষকে দায়ী করে। অবশ্য তাদের একটি 'কনভেনিয়েন্ট স্কেপ গোট' বা সহজ নন্দঘোষ হলো পাতানো নির্বাচন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নাগরিক সমাজ। কিন্তু কোনো গণতন্ত্রমনা নাগরিকই অবৈধ ক্ষমতা দখলের পক্ষ নিতে পারে না। তবে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুঃখময় অভিজ্ঞতা এড়াতে হলে আমাদেরকে ওয়ান ইলেভেনের ভূত তাড়াতে হবে। তাই আমার প্রস্তাব হলো, একটি নিরপেক্ষ কমিশনের মাধ্যমে বিষয়টির তদন্ত করানো, যাতে নাগরিকরা জানতে পারে কাদের পাতানো নির্বাচনের অপচেষ্টারর ফলে, কাদের ষড়যন্ত্রের কারণে এবং কাদের আন্দোলনের কারণে সেদিন ক্ষমতার পট পরিবর্তন হয়েছিল! অতীতের দুঃখময় ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে এবং আগামীতে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করতে হলে আমাদেরকে দায়িত্বশীল হতে হবে।

সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য: সাধারণভাবে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ৫০টির বেশী অনুচ্ছেদকে, যার মধ্যে জাতির পিতার ছবি টাঙ্গানোর বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত, সংশোধনের অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এতগুলো অনুচ্ছেদ সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না এবং নয়ও। একটি ইমারতের পিলারগুলো মৌলিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, কিন্তু দরজা জানালা নয়। তাই সংবিধানের প্রায় এক-তৃতীয়াংশকে মৌলিক কাঠামো বলে ঘোষণা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। প্রসঙ্গত, এর ফলে সংবিধানের তৃতীয়ভাগে অন্তর্ভুক্ত নাগরিকের মৌলিক অধিকারও আর সম্প্রচার (যেমন, শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষনা) করা যাবে না।

সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন: আওয়ামী লীগ তার 'দিনবদলের সনদ' শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহারে সুস্পষ্টভাবে অঙ্গীকার করেছে, "জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা হবে।" নির্বাচন পরবর্তীকালে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ভবিষ্যতে সংবিধান সংশোধন করে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন করার ঘোষনা দিয়েছেন (*প্রথম আলো*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০)। এছাড়াও এ সকল আসনে সরাসরি নির্বাচনের জন্য নারী সমাজের ঐক্যবদ্ধ দাবি রয়েছে। এসব অঙ্গীকার ও দাবি উপেক্ষা করে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট সরকার জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা বিরাজমান ৪৫ থেকে ৫০-এ উন্নীত করেছে এবং একই ধরনের পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি অব্যাহত রেখেছে।

বর্তমান করণীয়

- ভবিষ্যতের সঙ্কট এড়াতে হলে আজ জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজন আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তনের একটি কার্যকর উদ্যোগ। এ উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য হতে হবে রাজনীতিকে সংসদকেন্দ্রীক এবং আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা। সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী করা। একইসাথে ধর্মকে রাজনীতির বাইরে রাখা। এ লক্ষ্যে নব্বইয়ের তিন জোটের রূপরেখার মতো প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে।
- দুই টার্মের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বহাল রাখা। প্রধান উপদেষ্টা কে হবেন, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা নির্ধারণ করা।
- তিন জোটের রূপরেখার আদলে আগামী দু'টি নির্বাচনের জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করে তা কঠোরভাবে মেনে চলা।
- সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে বাধাগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা, যাতে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনে হতে পারে। নির্বাচনে টাকার খেলা ও পেশীশক্তির প্রয়োগ নির্মূল করা এবং ব্যবসায়ীদের পরিবর্তে রাজনীতিকে জনকল্যাণে নিবেদিত রাজনীতিবিদদের চারণভূমিতে পরিণত করা।
- নির্বাচন কমিশনকে সত্যিকারার্থেই স্বাধীন ও শক্তিশালী করা। কমিশনসহ সকল সাংবিধানিক পদে সৎ, যোগ্য ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ নিশ্চিত করা।
- জরুরিভিত্তিতে দলতন্ত্র ও ফায়দাতন্ত্রের অবসান ঘটানো এবং প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা।
- গভীর সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোকে গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জনকল্যাণমূখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।
- আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।